Ode to a Leader
নির্মলেন্দু গুণ

'আমি জন্মদিন পালন করিনা,'
-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
১৭ মার্চ ১৯৭১।

তিনি তাঁর জন্মদিন পালন করতেন না।
জন্মদিন পালন করাকে তিনি সময়ের
অপচয় বলে মনে করতেন।

তিনি ভাবতেন, সময় নষ্ট করার মতো সময় তাঁর নেই।
তিনি তো জানতেন, সন্ধ্যে নামবার আগেই
তাঁকে পৌঁছুতে হবে তাঁর গন্তব্যে।
এবং আমরা, আমরা যারা তাঁর অনুসারী ছিলাম-
জানতাম, ১৯৬৬ সনের ৫ ফেব্রুয়ারি থেকেই জানতাম,
তাঁর গন্তব্য কোথায়।

নরক থেকে মুক্তির আশায় প্রহর গুনছিল যে-জন্মভূমি,
সেই জন্মভূমির স্বাধীনতার সঙ্গে অভিন্ন বন্ধনে
তিনি গেঁথে নিয়েছিলেন তাঁর নিজের জন্মদিনটিকে।

তিনি তাঁর জন্মদিন পালন করতেন না বলেই,
তাঁর পক্ষে, তাঁর জন্মভূমিকে মুক্ত করা সম্ভব হয়েছিল।

তিনি তাঁর জন্মদিন পালন করতেন না বলেই--
বাংলাদেশের মানুষ আজ
তাঁর জন্মশতবর্ষ পালন করছে 'মুজিববর্ষ'-রূপে।

জন্মদিন পালন না করে,
জন্মভূমির মুক্তির জন্য
তিনি যে সময় বাঁচাতেন--
আমরা তা না বুঝলেও
তার অর্থ ঠিকই বুঝেছিল
বাংলার নদী, মাটি, গাছ।

তিনি তাঁর জন্মদিন পালন করতেন না বলেই--
আজ গাছে-গাছে নবপত্র দল
বসন্ত বাতাসে দুলছে।
প্রতিটি নদীর তীরে তীরে
মহানন্দে দোলখাচ্ছে ফিঙে পাখিরা।

আপনি মুক্তির যে-গান আমাদের শুনিয়েছিলেন,
সেইগান বাংলার আকাশ ছাড়িয়ে,
আজ ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের আকাশে।

আমি কোটি মানুষের কৃতজ্ঞ চোখের অশ্রু,
প্রাণের আনন্দ ও বেদনার দীর্ঘশ্বাস দিয়ে
আপনার উদ্দেশে এই মহিমা গান রচনা করেছি।

এই শব্দব্রহ্মজ্যোতির অর্ঘ্য
আপনি গ্রহণ করুন, পিতা।

অনন্ত মুজিব জন্ম
মুহম্মদ নূরুল হুদা

মুহূর্তে মুহূর্তে তুমি জন্ম নাও তোমার ভিতর,
মুহূর্তে মুহূর্তে তুমি জন্ম নাও আমার ভিতর;
মুহূর্তে অনন্ত জন্ম, এই মাটি অমরা বাসর;
বাঙালি মুজিব জাতি, চিরবাংলা মুজিবের ঘর।

কে বলে তোমার জন্ম এই বঙ্গে শুধু শতবর্ষ আগে?
কে বলে তোমার জন্ম থেমে গেছে ঘাতক মৃত্যুতে?
তুমি আছো স্বর্গে-মর্ত্যে উদয়াস্ত অভ্র অনুরাগে,
পলে পলে পল্লবিত, সর্বভূ-তে, সব ফলন্ত ঋতুতে।

জলেস্থলে অন্তরীক্ষে যে-মুহূর্তে বিশ্ব-মন-মাটি
ত্রিভুবন ঘুরে এসে মিশে গেছে খড়ো বঙ্গনীড়ে,
গণবাঙালির সেই স্বর্গাদপি আদিমাটি, পরিপাটি,
ধারণ করেছে এক বিশ্ব-ভ্রূণ, এই মধু-গঙ্গা তীরে;

অনন্তর অন্তরঙ্গে বাঙালির স্বাধীনতা, সাম্য, সদাচার;
সর্ব-অঙ্গে সর্বপ্রাণে বাঙালি, মানুষ আর প্রাণী একাকার;
প্রমিত স্বরূপ তার প্রমূর্ত বিমূর্ততার, সর্বমানবিকতার;
মানুষ, বাঙালি আর জাতিমৈত্রী: উৎসে শুধু শুদ্ধাচার।

অনন্তর জাতি বাঙালির বুকে মানবিক জনক উদগ্রীব,
অনন্তর অনন্তজন্মের বুকে নৈয়ায়িক জনক মুজিব।

আবার দেখা হবে
কামাল চৌধুরী

আবার দেখা হবে টুঙ্গিপাড়ায়
গিমাডাঙা স্কুলে, ফুটবল মাঠে
মধুমতি, বাইগারের জলে, দুরন্ত বালকের স্মৃতির সকালে
প্রতিদিন সূর্যোদয়ে, প্রতিদিন আগত সন্ধ্যায়–

বাংলাদেশ, আমি নত হয়ে বসে থাকি পদতলে
স্বাধীনতা, আমি পতাকার নিচে অসমাপ্ত জীবনী পাঠক
তোমার সমাধিসৌধে অনন্ত প্রার্থনা হাতে রেখেছি গোলাপগুচ্ছ
এত লাল! রক্তাক্ত হাতে হাতে ভেসে যাচ্ছে পদ্মা মেঘনা যমুনায়–
অবগাহন শেষে দেখা হবে শরীর ভেজা রোদে
যেখানে আমার দেশ সমাহিত মহিমায় খুঁজছে তোমাকে।

আবার দেখা হবে টুঙ্গিপাড়ায়
আশ্চর্য শব্দের গায়ে ঝরে পড়ছে ফোটা ফোটা বিনম্র আকাশ
সেখানে প্রতিদিন তোমাকে লিখছে বাংলা কবিতা
মহাদেশ পাড়ি দিচ্ছে তোমার মুক্তির মন্ত্র, জাতিরাষ্ট্র, জাগরণ,
বাঙালির ভোর।

০২.
আবার দেখা হবে রেসকোর্স ময়দানে
স্কুল পড়ুয়া বালকের রাগী বিকেলের রোদে
জনস্রোতে, লক্ষ লক্ষ মানুষের চিৎকারে, স্লোগানে
ইতিহাস বদলে দেওয়া তর্জনীর পাশে
অপরাহ্ণের রক্তপলাশে
প্রতিটি প্রদীপ্ত উচ্চারণে
প্রতিটি মুক্তির শব্দে, স্বাধীনতায়।

আবার দেখা হবে রেসকোর্স ময়দানে
যখন উত্থিত হাত আমাদের সাহসী যৌবন
যার যা আছে তাই নিয়ে যখন নিরস্ত্র মানুষ
দাঁড়িয়ে পড়েছে হত্যাকারীর মুখোমুখি
যখন মাঠের শপথ ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে
যখন ইতিহাসের পাতায় পাতায়
গর্জে উঠছে শিমুলের লাল
যখন বজ্রকণ্ঠে কথা বলছে চুয়ান্ন হাজার বর্গমাইল
সাতকোটি জীবিত সন্তান;
কথা বলছে বাংলাদেশ
কথা বলছে শেখ মুজিব
কথা বলছে সার্বভৌম জাতির পতাকা।

আবার দেখা হবে টুঙ্গিপাড়ায়, দেখা হবে রেসকোর্স ময়দানে।

একটি মানুষ যখন একটি দেশ
মুহম্মদ জাফর ইকবাল

আজ থেকে ঠিক একশত বছর আগে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে মায়ের কোল আলো করে একটি শিশুর জন্ম হয়। কেউ তখনও জানত না প্রায় অর্ধশতাব্দী পর এই শিশুটি এবং একটি দেশ সমার্থক হয়ে যাবে–তিনি হবেন বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের স্থপতি, একজন রাষ্ট্রনায়ক এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর জীবনের মতো বর্ণাঢ্য, ঘটনাবহুল, বৈচিত্র্যময় এবং অবিশ্বাস্য জীবন কাহিনী এই পৃথিবীতে খুব বেশি নেই। একদিকে তিনি ছিলেন প্রায় অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী একজন রাজনীতিবিদ, একজন নেতা এবং সংগঠক, অন্যদিকে তিনি ছিলেন এই দেশের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের কাছাকাছি একজন মাটির মানুষ। সারা পৃথিবীর মানুষ এখন জানে, কোনো আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি ছাড়া লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে, তাদের মুখের ভাষায় কথা বলে মাত্র আঠারো মিনিটের একটি ভাষণে তিনি একটি দেশের গতিপথ নির্ধারণ করে দিতে পারেন।

তরুণ বয়সে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর হাত ধরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন রাজনীতি শুরু করেছিলেন তখন এই উপমহাদেশে রাজনীতির সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র ছিল ধর্ম। সময়টি ছিল ধর্ম নিয়ে ভেদাভেদের সময়, হানাহানি এবং রক্তপাতের সময়। এই কলুষিত দুঃসময়েও বঙ্গবন্ধু ছিলেন বিস্ময়করভাবে ধর্মনিরপেক্ষ, ধর্ম পরিচয় নয়–মানুষ পরিচয়টিই ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়ো। তাই ৪৬ সনের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময় তিনি হিন্দু এবং মুসলমানদের সমানভাবে রক্ষা করেছেন, পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় লঙ্গরখানা খুলে সকল ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে অন্ন জুগিয়েছেন। তাঁর রাজনৈতিক দল আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম পরিবর্তন করে সকল ধর্মের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য 'আওয়ামী লীগ' নামকরণ করেছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানেরও একটি মূল আদর্শ ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা। এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীতে যখন আবার ধর্ম নিয়ে হানাহানি শুরু হয়েছে তখন সবাই বঙ্গবন্ধুর মতো একজন পুরোপুরি মানবিক নেতার অভাব তীব্রভাবে অনুভব করে।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক মেধা ছিল অবিশ্বাস্য। তাই ভারত পাকিস্তান দেশ ভাগের এক বছরের ভেতর তিনি বুঝে গিয়েছিলেন, যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য তিনি আন্দোলন করেছিলেন সেই রাষ্ট্রটি বাঙালিদের জন্য কোনো মঙ্গল বয়ে আনবে না। তিনি তার প্রমাণও চোখের সামনে দেখতে পেলেন। শুধু বঞ্চনা এবং শোষণ নয়, পাকিস্তান নামের রাষ্ট্রটি বাঙালিদের নিজের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার অধিকারটুকুও দিতে রাজি নয়। রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন করে তিনি সেই ৪৮ সালে প্রথমবার জেলে গেলেন–তারপর কতবার জেলে গিয়েছিলেন মনে হয় তার কোনো হিসাব নেই! বঙ্গবন্ধু সঠিকভাবে বুঝেছিলেন বাঙালিদের দাবি আদায় করে নেবার জন্য দরকার একটি সুগঠিত শক্তিশালী রাজনৈতিক দল। দল সংগঠিত করার জন্য তিনি মন্ত্রিত্ব পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিলেন। আওয়ামী লীগের একজন কর্মী হিসেবে শুরু করে তিনি দেখতে দেখতে সত্যিকারের নেতা হয়ে উঠলেন। প্রথমে যুগ্মসম্পাদক, তারপর সাধারণ সম্পাদক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর সবশেষে সভাপতি। ১৯৫৮ সালে শুরু হলো আইয়ুব খানের সামরিক শাসন, সারা দেশে রাজনৈতিক নেতাদের ওপর জেল-জুলুম, বঙ্গবন্ধু তার মাঝে তাঁর দলকে সংগঠিত করে চললেন।

বঙ্গবন্ধু আজীবন রাজনীতি করেছেন দেশের মানুষের জন্য, তাঁর স্বপ্ন ছিল বাঙালির স্বাধিকার। শক্তিশালী সুসংগঠিত একটি রাজনৈতিক দলের সভাপতি হিসেবে তিনি বাঙালির স্বাধিকারের জন্য ১৯৬৬ সালে ছয় দফা ঘোষণা করলেন। ঘোষণা দিয়েই শেষ নয়, সারাদেশ ঘুরে ঘুরে তিনি ছয় দফার পক্ষে বিশাল জনমত গড়ে তুললেন। ছয় দফার সনদটি ছিল স্বাধিকারের মোড়কে ঢাকা স্বাধীনতার ডাক। দেশের মানুষ তাই ছয় দফাকে লুফে নিল, বঙ্গবন্ধুর পিছনে একতাবদ্ধ হতে শুরু করল প্রবল আগ্রহে। বিপদ টের পেয়ে আইয়ুব খানের সরকার শুধু বঙ্গবন্ধু নয়, তাঁর দলের ছোটো বড়ো সব নেতাকে জেলখানায় পুরে রাখল। শুধু তাই নয়, তাদের অস্তিত্বের জন্যে 'বিপজ্জনক' এই নেতাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেবার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলা চাপিয়ে দেওয়া হলো।

দেশের সেই ক্রান্তিলগ্নে ১৯৬৯ সালে তখন ছাত্র সমাজ এগিয়ে এসেছিল, সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ তৈরি করে তারা সারাদেশব্যাপী একটি বিশাল গণআন্দোলন শুরু করে দেশকে উথাল-পাথাল করে দিলো। আইয়ুব খানের সরকার বাধ্য হলো বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে। দেশের ছাত্র-জনতা তাদের নেতাকে ফিরে পেয়ে ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্সের ময়দানে ১০ লক্ষ থেকে বেশি মানুষের সামনে তাঁকে প্রথমবার 'বঙ্গবন্ধু' হিসেবে সম্মানিত করে, সেই থেকে তিনি সবার কাছে বঙ্গবন্ধু হিসেবে পরিচিত।